OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 713 - 718
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘পার’ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর নান্দনিক রুপায়ণ

অনিন্দিতা ভূঞ্যা
গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: aninditabhunia614@gmail.com
0009-0009-4713-3584

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
সামন্ততন্ত্র, প্রলেতারিয়েত, স্বার্থবাদী, মুঙ্গের, শ্রেণি বৈষম্য, শট, চিত্রনাট্য, মেটাফর, ক্যামেরা।

Abstract
Famous director and screenwriter Gautam Ghose directed the film 'Paar' in 1984, based on Samaresh Basu's short story 'Paari'. The story depicts how a fleeing Dalit couple, trying to escape feudal atrocities in Bihar, falls victim to the heartless exploitation of selfish oppressors in a capitalist city. The protagonist, Naurangia, and his wife Rama represent the exploited peasant class. The film portrays the indifferent injustice and oppression of the feudal system through characters like Bhola, Hari Singh, the Sardar, and the Mahajan. A protest erupts in a Dalit village of the 'Mushahar' caste in Bihar's Munger district after the government fails to grant them their rightful dues. For the displaced proletarian couple, there remains no path to satisfy their hunger amidst deep isolation. Ultimately, Naurangia has to endure the relentless cruelty of feudal rule and exploitation until the end of the screenplay.

Discussion

‘সাধ্যাতীত’ বলে কোনো শব্দভান্ডার হয়তো গৌতম ঘোষের মনন বা দর্শনে বরাবরই ছিল না। হ্যাঁ, এককথায় দর্শনই বলা যেতে পারে। জীবনে কোন মোড়কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে দেখেছেন যার চলৎপ্রবাহ তাঁর কাজে সুসজ্জিত রয়েছে। এই অনুভূতিই যখন শৈল্পিক স্থানে পদমর্যাদা লাভ করে তখন তা খাঁটি জহরতে পরিণত হবেই। শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ সাহিত্য আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তাৎপর্য বহন করছে বটে; তাতে গ্রহণ-বর্জন মিলিয়ে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র শিল্পকে দৃঢ় সজ্জায় আধুনিক ধাঁচের দ্যোতনা রূপে গ্রহণ করে এসেছে বরাবর আপামর দর্শকেরা। সাহিত্য যেখানে সংলাপ ও বর্ণনার ব্যঞ্জনায় আভাসিত, সেখানে চলচ্চিত্র ধ্বনি ও চিত্রের ইমেজে রূপকল্প নির্মাণ করে। অতিরিক্ত সংযোজন কিংবা বর্ণনাত্মকের ভাব চলচ্চিত্র বহন করে না। চলচ্চিত্র নিজ গতিতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন। সেই চলচ্চিত্রের শিল্পী হিসেবে যেখানে গৌতম ঘোষ কথা বলেছেন, সেখানে ভাব-গভীরতায় চলচ্চিত্রে গাম্ভীর্য ও প্রতীকীয়তা অটুট থেকেছে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে ত্রয়ী কিংবদন্তি যথা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন প্রমুখ চলচ্চিত্রকে পূর্বের একঘেয়েমি চিত্র থেকে নতুন কিছু করে দেখিয়েছিলেন। যা দর্শকবর্গ আজও সেটাকে বাহবা দিতে তৎপর। সেই ঐতিহ্যপূর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে গৌতম ঘোষ তথ্যচিত্রের পাশাপাশি কাহিনিচিত্রের আস্ফালন বারেবারে ঘটিয়ে চলেছেন। তাঁর কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্র দুটোই সমসাময়িক ঘটনাকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কেন্দ্র করে। বিশ শতকে দাঁড়িয়েও দর্শককে কোন আখ্যান আকৃষ্ট ও মনোগ্রাহী করতে পারে এবং বাস্তবিক সময়ের উপলব্ধি ঘটাতে পারে, তার দক্ষ কুশীলব আমার মতে গৌতম ঘোষ।

তাইতো কমলকুমার মজুমদারের তত্ত্বীয় ভাষার রচনা 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র মতো কাহিনিকে তিনি কাহিনিচিত্র হিসেবে বাছাই করেন। এই আস্পর্ধাকে অবশ্য সত্যজিৎ রায় সাধুবাদ জানিয়েছিলেন মজার ছলে –

> "তুমি 'অন্তর্জলী যাত্রা' করবে ভাবছ? তোমার সাহস তো বেড়ে বটে!"[১]

এই ঔদ্ধত্য বা সাহস না থাকলে দর্শক তাঁকে স্মরণীয় করে রাখত না। ১৯৭৪ সালে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত দেশের খাদ্য সংকটের চিত্র, করুণ পরিণতি সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি নিয়ে বর্ণনাত্মক তথ্যচিত্র 'হাংরি অটাম' তার সুখ্যাতির দরজায় পদার্পণ করেছিল।

রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' চলচ্চিত্রটি নিশ্চয়ই মনে পড়ে। একঝাঁক মাছমারার দল গঙ্গায় পাল তুলেছিল বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে। দুঃখ - দুর্দশা এবার হয়তো ছুঁতে পারবে না তাদের; সুদিন আসতে চলেছে এই আশায়। আশাবাদীদের চোখ বুনন করেছেন নানা আঙ্গিকে নানা চলচ্চিত্রকারেরা। অপু ঘাড় বেঁকিয়ে কলকাতা শহরকে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নবিত্ত ঘোচানোর স্বপ্নে 'অপরাজিত' (১৯৫৬) চলচ্চিত্রে, দেশের শিকড়চ্যুত একটি পরিবারের মেয়ে নীতা একটা চাকরির প্রতীক্ষায় ক্লান্তিকর বিন্যাস তোলে 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রে। নওরঙ্গীয়া হাঁ করে হাওড়ার ব্রিজ থেকে গঙ্গার সুদূর পানে চেয়ে থাকে, মাথা গোঁজার অবকাশ কোথায়? কোথায় বা এর শেষ? গৌতম ঘোষের 'পার' চলচ্চিত্রে নিম্নবিত্তের জীবন সংগ্রামের উত্তরণ নাকি শুধুই দীর্ঘশ্বাস তা এই চলচ্চিত্রের দ্যোতনা রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা কতখানি কায়েম ছিল তা চলচ্চিত্রের নান্দনিকতার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেটাই আমার আলোচনার অবকাশ।

সমসাময়িক চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকদের তুলনায় একটু ভিন্ন দর্শন ও মতাদর্শে চিত্রকল্পের সঙ্গে রসকল্প মিলিয়ে স্বতন্ত্র ধারার তথ্যচিত্র ও কাহিনিচিত্র একের পর এক নির্মাণ করে চলেছেন গৌতম ঘোষ। জন্মসূত্রেই কলকাতায় বড়ো হয়ে ওঠা, তাই আধুনিক সমাজের দর্শকদের ভালো লাগাকে যেমন প্রশ্রয় দিয়েছেন তেমনি শিল্পের অবকাঠামোগত সৌন্দর্যের দিকেও নজর রেখেছেন। প্রথম তথ্যচিত্র 'নিউ আর্থ' নির্মাণ করেন ১৯৭৩ সালে। পরে 'মা-ভূমি', 'দখল', 'পার', 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দেখা', 'আবার অরণ্যে' প্রভৃতি কাহিনিচিত্র একের পর এক প্রদর্শন করিয়েছেন দর্শকবৃন্দকে। 'দখল' (১৯৮২) চলচ্চিত্রটি মুক্তিলাভের পর তিনি তথ্যচিত্র শুরু করেছিলেন। আবার এর ফাঁকে কাহিনিচিত্র নির্মাণের কথাও ভাবছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্যচিত্র হল – 'হাঙ্গরি অটম', 'ল্যান্ড অফ স্যান্ড ডিউনস', 'কালাহান্ডি', 'বিয়ন্ড দ্য হিমালয়াস' ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তথ্যচিত্র হল - রাজা রামমোহন, বিসমিল্লা খান, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জ্যোতি বসু, কে জি সুব্রামনিয়াম প্রভৃতি। ১৬টি জাতীয় পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপক তিনি। গৌতম ঘোষের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের কাহিনিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তাঁর চলচ্চিত্রগুলির ভাষাগত বন্ধনে আবদ্ধ থাকেননি তিনি। প্রথম দিককার চলচ্চিত্রগুলো কোনোটা হিন্দি, তেলেগু, কোনোটা আবার বাংলায় পরিচালিত করেছেন। সেখান থেকেই বোধগম্য হয় তাঁর চলচ্চিত্রের বা চিত্রনাট্যের ভাষা একমাত্র শিল্পের ভাষা। তাঁর চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে একথা তিনি পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপিত করেন –

> " 'পার' - এর চিত্রনাট্যে সংলাপ অসম্ভব সুন্দর ভাবে বিহারের স্থানীয় হিন্দিতে নতুন রূপে রচনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সুরেন্দ্রপ্রতাপ সিং। ওঁর সংলাপ এত ভালো বলেই এই চিত্রনাট্যের খন্ডে বিবরণ বাংলায় দেওয়া হল কিন্তু সংলাপগুলো বাংলা হরফে হিন্দিতে রাখা হয়েছে। আশা করি পাঠকের ভালো লাগবে।"[২]

এবার আসা যাক, 'পার' চিত্রনাট্যের প্রেক্ষিত কি বা এটি কোন ধরনের চিত্রনাট্য রূপে বিবেচিত? গৌতম ঘোষ যে কাহিনি অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করুন না কেন, তিনি বরাবরই সাম্প্রতিক সময়কে কাহিনির সঙ্গে সংযোজন করে দর্শকবর্গকে মুগ্ধ করেছেন। 'পার' তেমনই এক চিত্রনাট্যের কাহিনি। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার দ্বারা প্রভাবিত একদল নিম্নবিত্তের শ্রেণিযুদ্ধ জীবন সংগ্রামের চরম করুণ পরিণতিতে উপস্থিত রয়েছে। কাহিনিটি সমরেশ বসুর 'পাড়ি' গল্প অবলম্বনে একটি মিশ্র প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে অন্য একটি বাস্তব কাহিনিকে সংযোজন করে সমসাময়িক কালের বাস্তবোচিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সময়ের পটভূমি তুলে ধরেছেন। সময়টা ১৯৮২-র পরবর্তী সময়। 'দখল' চলচ্চিত্র মুক্তিলাভের পরবর্তী সময়ে বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলে দাঙ্গা, মারামারি, গুলি চালানো প্রভৃতি সংঘর্ষ ও রেষারেষি চালু হয়। বহু মানুষের আতঙ্ক ও মৃত্যুর খবর আসে। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্বাভাবিকবশতই এক শিল্প স্রষ্টাকে পীড়িত করে। আর শিল্প স্রষ্টাদের সজাগ থাকতে হয় ভিন্ন আঙ্গিক ও সৃজনশীল কিছু গল্প তুলে ধরার। গৌতম ঘোষও পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে এর ব্যতিক্রম নন। সেই বিহারের মুঙ্গের বাসিন্দাদের 'পাড়ি' গল্পের চরিত্রগুলির সাথে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এক অভূতপূর্ব কাহিনির বয়ান নির্মাণ করলেন তিনি।

তাঁর প্রথম দিককার প্রায় চলচ্চিত্রে ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব খুব প্রকটরূপে দেখানো হয়েছে। এর পেছনে কারণ সম্পর্কে গৌতম ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন –

> "আমরা যখন কলেজ টলেজে পড়ি তখন ষাটের দশক। সেটা ছিল এক উত্তাল সময়। কলকাতায় তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন চলছে। তারপর বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ পূর্বাবস্থা। তো সেই সময় একাডেমিক পড়াশোনা আমার ঠিক মনপছন্দ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল নতুন একটা কিছু করি।"[৩]

যেহেতু দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের মতো স্পর্শকাতর ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তিনি, তাই তাঁর অমোঘ সৃষ্টির মধ্যে সেই ঘটনার রেশটুকু থেকে যায়। কীভাবে একশ্রেণি খেটে খাওয়া মজুরশ্রেণির ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তা পূর্ব থেকে চলে আসছে। এই ক্ষমতাবলয়ের মূল ভিত্তি হল ভূমি ও সম্পদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রন। সেই সম্পর্কে চিত্রনাট্যে পরিচালক প্রাককথন হিসেবে বলেছেন –

> " 'পার' হচ্ছে এখানে একটা মেটাফর - প্রতীক। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা পর্যায় আসে যেটা মনে হয় পার হতে পারব কিনা! বা মনে হয় পারাপার করা যতই কঠিন হোক না কেন, পার আমাকে হতেই হবে।"[৪]

এ শুধু নিম্নবিত্তের পাশবিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আজকের কথা নয়; স্বয়ং সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে মৃণাল সেনের চরিত্র ও কাহিনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রনাট্যের কাহিনি শুরু হচ্ছে এভাবে-

দৃশ্য-১ –

> "সন্ধ্যা নামছে। আকাশের গায়ে এখনো দিনের শেষ আলো লেগে। মিউজিক - ক্যামেরায় দেখা যায় সামনে আঁকা-বাঁকা রাস্তা। মোটরবাইক আর জিপের আলো দূর থেকে কাছে এসে বেরিয়ে যায়।"[৫]

আবার পরমুহূর্তে দৃশ্যে দেখা যায় -

দৃশ্য-১ –

> "মন্দিরের ভেতরে বাইরে টর্চের আলোয় দেখা যায়। গুলি চলছে। লুটিয়ে পড়ছে গ্রামবাসীরা। আর্তনাদ। মন্দিরে হাড়িকাঠের দিকে একজন আসে গুলি খাওয়া অবস্থায়। পড়ে যায়। এই নারকীয় ঘটনা দেখে ছেলেটি বমি করতে শুরু করে।।"[৬]

গৌতম ঘোষ ইচ্ছে করেই কাহিনিটি সান্ধ্যকালীন পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন; যে সন্ধ্যার পরিবেশ নিম্নবিত্তের পরিশ্রমের পরবর্তী লগ্নে আস্তানা খুঁজে নেওয়ার পালা, সেই সন্ধ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে ধীমান দাশগুপ্ত বলেছেন –

> "ক্যামেরা বাইরে বেরিয়ে গুন্ডাবাহিনিকে ধরে। জান্তব হিংস্রতায় তারা ক্রমশ ঢুকে পড়েছে গ্রামের মধ্যে। গৌতম তাদের পরিচয় গোপন রাখেন। ... গৌতম তাঁর দর্শককে উৎকণ্ঠায় রাখেন।"[৭]

আবার মন্দিরের মতো একটা পবিত্র জায়গাতে বীভৎস রকমের গুলি ছোঁড়ার নারকীয় দৃশ্য চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতীক চরিত্রগুলির সংলাপ মাধ্যম পর্দায় তুলে ধরার আগেই দর্শকদের সন্দিহান করে তোলা হয় চরিত্রের মাধ্যমে। তবেই চলচ্চিত্রের সার্থকতা।

ফিউডাল শাসন ব্যবস্থা 'দখল' থেকে কীভাবে 'পার' চলচ্চিত্রে বিস্তারিত আকারে পুঁজিপতিরা আধিপত্যবাদী শ্রেণি হয়ে উঠছে গায়ের জোরে এবং সরকারকে অমান্য করছে - তা স্পষ্ট উল্লেখিত। শ্রমজীবী শ্রেণির উৎপাদিত কাঁচামালের ন্যায্য পাওনা পাওয়ার অধিকার থেকে মুঙ্গের অঞ্চলের শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক টানাপোড়েন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সামন্ততন্ত্র ও প্রলেতারিয়েতের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। অবশেষে ৩৬টি শুয়োর পালকে নিয়ে গঙ্গা পারাপারের ভয়াবহ কর্মসংস্থান জোটালো। 'দখল' সিনেমাতে আমরা দেখি স্থানীয় জমিদার-লেঠেলদের কুপ্রস্তাব কাকমারা সম্প্রদায়ের অন্যতম এক প্রধান চরিত্র বিধবা 'আন্দি'কে বাধ্য করা হয় বাস্তুভিটের অধিকার ছেড়ে দিতে। তবে চিত্রনাট্যে সম্প্রদায়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে তাদের ব্যক্তিগত বর্ণনার পক্ষপাতিত্ব বেশি নজরে এনেছে বলে আমার মনে হয়। তবে 'পার' চলচ্চিত্রে প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু করে শেষ দৃশ্যের শুয়োর পাল পারাপারের পর বিশ টাকা উপার্জন পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক শাসন বহির্ভূত শোষণ ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি কায়েম হয়েছে টানটান উত্তেজনায়। চিত্রনাট্যে একটি বড়োসড়ো বর্ণ বিভাজন তুলে ধরা হয়েছে -

> " 'মা-ভূমি'-তে তেলেঙ্গানার লড়াই, 'দখল' - এ একটি অসহায়া মেয়ের একক সংগ্রাম – কায়েমি স্বার্থবাদী সংগঠিত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে; এবং এই দুইয়ের সার্থক উত্তরাধিকারি রূপেই 'পার' আমাদের কাছে আসে। ..."[৮]

ছবির প্লট নির্মিত হয় বিহারের মহাজন অধ্যুষিত কৈরি গ্রামে। নওরঙ্গিয়া, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রামা ও নওরঙ্গিয়ার বাবা-মায়ের এক পরিবারের চিত্র প্রথম থেকে লং শটের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে গাঢ় অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে; লম্ফতে কেরোসিনের অভাব পারিবারিক অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার এক নিম্নবিত্ত চেহারা প্রথমেই দর্শককে এই কারণে উপলব্ধ করানো হয় যাতে ভোলা, হরি সিং - এর মতো স্বার্থবাদী সামন্ততান্ত্রিক মতভেদ পোষণকারী ব্যক্তির পাশবিকতা নিখুঁত শটে ফুটিয়ে তোলা যায়। শ্রমিক ও কৃষকবর্গের শ্রমের ওপর সরকার মজুরি ঠিক করে দিলেও মালিকশ্রেণি তা মানছে না। উপরন্তু সেই মজুরি নিজেরা আত্মসাৎ করবার ফন্দি আঁটছে। তারই সঠিক নিয়ম বা অধিকারের লড়াই নিয়ে কণ্ঠস্বর তোলেন মাস্টারজি, রামনরেশ, নওরঙ্গিয়া প্রভৃতি চরিত্রেরা। স্বার্থবাদী অধিকার কায়েমেও সামিল হয় বিশেষ ব্যক্তিবর্গ পুলিশ, মন্ত্রী প্রভৃতি। গ্রামের শিক্ষিত মাস্টারমশাই এর প্রতিবাদ করেন -

> "সরকারি বিধানকে অনুসার হালওয়াহা মজদুরীকে রূপ মে ঢাইসের আনাজ তথা বটাই পর পনদ্রা কাট্টা জমিন কা হকদার হায়।"[৯]

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ এ কথা মানতে নারাজ। সার্বিক শোষণ পন্থায় প্রলেতারিয়েতদের আশ্বাসের পরিবর্তে ভীতি জাগায় হরি সিং-এর মতো শাসক দল -

> "সব নীচ জাতকো লোগ যব মনমে আতা হ্যায় ফসল লুট লেতে হ্যায়, ইউনিয়ন বানাতে হ্যায়। ... কে আপ চাহতে হায় কে গাও মে খুন খারাবা হো যায়।"[১০]

অর্থাৎ বরাবরই পাঠক ও দর্শকবর্গ এই চিত্রের সাথে খুব সম্পর্কযুক্ত - বর্ণের বিভাজন, শ্রেণি বিভাজন। অন্যান্য চিত্রনাট্যকারের চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপট নিয়ে চরিত্র - ঘটনা নির্মিত হলেও গৌতম ঘোষের চিত্রনাট্যে বিভাজনগুলিই যেন সংলাপ বলে, চরিত্রের ভূমিকায় পর্যবসিত হয়। এখানেই গৌতম ঘোষের চিত্রনাট্যের সার্থকতা। সামন্ততন্ত্রের শোষণ - বিপর্যয় নিম্নবিত্ত শ্রেণির কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি মিটিয়ে দিতে হয় নওরঙ্গিয়া ও তার পরিবারকে। মাস্টারজি খুন হওয়ার পরেও কোনো পদক্ষেপ নেননি উচ্চপদস্থ সরকার। আবার গ্রামের ঘরবাড়িতে দাঙ্গা - হাঙ্গামার পর আগুন জ্বালিয়ে দিলেও কর্তৃপক্ষ বৃহৎ আকারের ভাষণ গেয়ে ঘটনার যবনিকা টানে। গৌতম ঘোষ এই চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে কনটেন্টের পাশাপাশি ফর্মকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। নওরঙ্গিয়া ও রামা গ্রামে দাঙ্গার দিন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরে পরিণত ঘটনার পূর্বসূত্রকে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। যাতে ফর্মটি আরও এলাবরেট ভাবে উপস্থাপিত হয়। চলচ্চিত্রের শেষের দিকে তিনি খানিকটা ক্লোজ শটে শুধুমাত্র মূল চরিত্র নওরঙ্গিয়া ও রামার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিণতি দেখায় অদ্ভুত এক সাহসিকতা ও জীবনযুদ্ধের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গঙ্গাবেষ্টিত বৃহৎ কলকাতা শহরে উদ্বাস্তুদের মতো ঘুরে ঘুরেও পেট চালানোর মতো কাজের সন্ধান মেলা না দম্পতির। নওরঙ্গিয়াকে এখানে সৎ ও পরিশ্রমী চিত্রে চিত্রিত করেছেন চিত্রনাট্যকার। এত বড়ো বড়ো কারখানা থাকা সত্ত্বেও কাজের লাইনে দাঁড়িয়েও কাজ পায় না নওরঙ্গিয়া ও অন্তঃসত্তা রামা। সর্দার জিজ্ঞেস করে - জাত কি? নওরঙ্গিয়া উত্তর দেয় – 'মুসহর'। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ মহাজন কাজের সূত্র জোগায় নারকীয় ভঙ্গিতে -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "নদী পার করানা পড়েগা। এক সুয়ার কা বারা আনা। ... সুয়ার পার করানে কে লিয়ে নৌকা নেহী মিলতা ইধার। তুমহি লোগো কো হাঁক কর পার করানা পড়েগা সমঝে।"[১১]

মালিক - মহাজনের শাসন-শোষণের প্রভাব সর্বত্র; আবার কাটমানির রেষারেষিতে সর্বস্ব নিংড়ে কিছুটা চুঁইয়ে আসে। তা পরিমাপমূলক ন্যায্য পাওনা নয়।

নারকীয় অমানবিক স্বার্থান্বেষী না হলে কিছু টাকার বিনিময়ে ক্ষুধার্ত দম্পতিকে এত বড়ো টালমাটাল গঙ্গায় ৩৬টি শুয়োর পাল পার করার ইঙ্গিত দেয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কায়েম জমিদার - লেঠেলবর্গ গ্রামেরই নিম্নবিত্তদের ওপর শাসনকার্য চালিয়েছে এমন নয়, শোষণের সর্বগ্রাসী চেহারা কলকাতার মতো বৃহৎ নগরীতেও নওরঙ্গিয়াকে মাথা পেতে নিতে হয়।

গৌতম ঘোষের অসাধারণত্ব কনটেন্ট চিন্তার পাশাপাশি ক্যামেরা ধরার কৌশলেও তিনি দক্ষ। সন্ধ্যের আলো কিংবা রাতের চিত্রের শট নেওয়ায় দক্ষ বলা চলে গৌতম ঘোষকে। চিত্রনাট্যের ঘটনা শুরু হয়েছে সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে। লং শটে পুরো দৃশ্য দেখাতে দেখাতে নওরঙ্গিয়ার পরিবারে ঢুকেছে ও ক্লোজআপের মধ্য দিয়ে। স্বদেশহারার বলিরেখা নওরঙ্গিয়া ও রামার মুখমণ্ডলে অপূর্ব নিখুঁত রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া মাস্টারজি যখন হরিসিংহে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলেন তখন তার চশমাটা যখন গাছের ডালে ঝুলেছিল সেই করুণ দৃশ্য দর্শকদের মনে সুগভীর প্রভাবিত করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা কি নিদারুন ভয়ঙ্কর - পাশবিক মর্মে আখ্যানের আপাদমস্তক প্রভাবিত করে তুলতে পারে এবং সেই সময়কার বিহারের দাঙ্গা - হাঙ্গামার পরিস্থিতিও 'পাড়ি' গল্পের এক দম্পতির শুয়োর পালকে পারাপার করার নির্মম চিত্রের যৌগ বা যৌথ ভাবনার প্রতিফলন এই 'পার' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। গ্রামীণ ক্ষমতার এমন এক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু জোতদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সমগ্র সমাজের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করছে। সেই শাসন টিকিয়ে রাখতে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা স্পষ্ট রূপে শটে তুলে ধরা হয়েছে। নদী পারাপারের কঠিন সংগ্রাম যেন সামগ্রিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদের প্রতীক। জোতদারদের সীমাহীন লোভ এবং প্রান্তিক কৃষকদের ওপর শাসনতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এক মর্মস্পর্শী দলিল এই 'পার'। যা আজও ভারতীয় সমাজ-বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক আধিপত্য কৃষকদের স্বাধীনতায় থাকুক; তবেই শ্রেনি বৈষম্য, বর্ণ বিভাজন ঘুচবে আশা করা যায়। গৌতম ঘোষের বয়ানে উল্লেখিত -

> "বাস্তবকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারব না। ভারতকেই যদি দেখি – একটা জটিল দেশ সেখানে উচ্চবর্গের মানুষের সাথে নিম্নবর্গের মানুষের ফারাক দিন দিন বাড়ছে, সেখানে আস্তে আস্তে শিল্পীরা এই বিশাল সংখ্যক নিম্নবর্গের মানুষরা দেশজ শিল্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাঁরা যদি এই বাস্তবকে চিত্রিত না করেন, তাহলে তাঁদের শিল্প কুয়োর মধ্যে আবদ্ধ ব্যাঙের মতো হয়ে পড়বে।"[১২]

Reference:

১. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৪, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ১৩০
২. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ৯০
৩. education. vikaspedia.in. গৌতম ঘোষ, শিক্ষা, জানুয়ারি ২৮, ২০২০
৪. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ৯০
৫. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ৯৩
৬. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ৯৬
৭. ঘোষদস্তিদার, গৌতম, 'পার : একটি শ্বাসরুদ্ধ অতিক্রম', 'সিনেমার সুখ-দুঃখ', প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ কলেজ স্ট্রিট, পৃ. ৫৭
৮. ঘোষদস্তিদার, গৌতম, 'সিনেমার সুখ-দুঃখ', পৃ. ৫৭
৯. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ১০২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 713 - 718
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ১০৩
১১. ঘোষ, গৌতম, 'চিত্রনাট্য সংগ্রহ', পৃ. ১২৩
১২. 'চলচ্চিত্রে বাস্তবতা : চলচ্চিত্রকারদের মুখোমুখি', চর্চা, বইমেলা সংখ্যা, ২০০১, নটচর্য্যা, কলকাতা -১৪, পৃ. ৫২-৫৩